মানুষ, মুনীর এবং কবর ঃ সরদার ফজলুল করিম

না, ফেলে রাখলে আর পারব না। এখন যাওবা ভাবছি যে, পারব, পরে মনে হবে, না, পারছিনে। মুনীরের 'কবর' আমার হাতের কাছে এবং চোখ ও মন উভয়ের সামনে।
কিছুদিন আগে, প্যাপিরাস থেকে মুনীরের 'কবর'কে সংগ্রহ করেছি। তারও কিছুদিন আগে ২৭ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে মুনীরের জন্মবার্ষিকীর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে একটি প্রশ্ন হিসাবে কথাটা আমার মনে বেজেছিল। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা 'মুনীর সম্মাননা' বিতরণের দিনে যেমন তাঁদের আমন্ত্রণপত্রে, তেমনি অনুষ্ঠানের বিবরণে, মুনীরের পরিচয়ে তাঁকে উপযুক্তভাবে বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ বলে উপস্থাপন করেছেন, সে জন্য উপস্থিত আমার কাছেও তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র, আবার আমার মনে একটু দুঃখবোধ হল এই দেখে যে, তাঁরা তাঁদের আমন্ত্রণপত্রে কিংবা তাঁদের আনুষ্ঠানিক বর্ণনায় কোথাও মুনীরের নামটি উচ্চারণের সময়ে 'শহীদ' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। যেন 'শহীদ' শব্দটি এখন বাহুল্য হয়ে গেছে। তার আর দরকার নাই।
মুনীরকে আমি কখনো 'মুনীর চৌধুরী' বলিনে এবং বলিনি। মুনীরকে আমি সর্বদা 'মুনীর' বলেই সম্বোধন করেছি। মুনীরও আমাকে 'এই সরদার' বলে ডেকে উঠেছে। পারস্পরিক তুমি তো বটেই। আসলে আমাদের দুজনের মধ্যে বয়সের কোন ভেদাভেদ ছিল না।
মুনীরও ১৯২৫-এ এসেছে এই ভুবনে, আমিও ১৯২৫-এ। অথচ হাস্যে, পরিহাসে, কথার ভঙ্গিতে, মিলনের আন্তরিকতায় ঃ তথা জ্ঞান ও সামাজিকতার সর্বক্ষেত্রে মুনীর আমার চাইতে কত বড় ছিল। আর তাই আমি আন্তরিকভাবে এবং অকৃপণভাবে আমার অস্তিত্বের এক অপরিহার্য অঙ্গবলে সব সময়ে ভেবে এসেছি মুনীরকে।
তবু কেমন করে যে আমার সঙ্গে পরিচয় ঘটল, কেমন করে ঘনিষ্ঠতা হল তা কিছুতেই আমি স্মরণ করতে পারছিনে। বহু বহু ঘটনা ঘটেছে আমাদের এই দুটি জীবনের অস্তিত্বের ঘটনায়, আন্তরিকতা এবং ভালবাসায়। এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আলাপে আলোচনায় যাওবা একটু পারি, লিখিত বর্ণনায় আদৌ নয়।
কিন্তু, হয়ত সেই ১৯৪৪-৪৫ সালের ঘটনা। আমরা রিজেন্ট পার্ক হলে (পাঠকরা কি একেবারেই চিনেন না?) ফ্যাসিবিরোধী এক পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম। আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধাস্পদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ নিশ্চয়ই তার উদ্বোধন করেছিলেন। ১৯৪২ সালে ৮ই মার্চ সোমেন চন্দ তখনকার একটি ফ্যাসিস্ট চক্রের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন আমাদের এই প্রদর্শনীর আগে। আমি সোমেনকে নিজে দেখিনি। ১৯৪২-এ মাত্র আমি আই এ পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হতে চলেছি। তবু সোমেনের স্মৃতিতে আমরা সবাই তখন উদ্বুদ্ধ বোধ করেছি। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও আমাদের পূর্ববঙ্গ তথা ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ তখন ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম প্রধান সাহিত্য এবং শিল্পী সংঘ। কমিউনিস্ট বলে আখ্যায়িত এবং পরিচিত। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, ঋষীপ্রতিম কাজী মোতাহার হোসেন, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসু ঃ ওঁরা সবাই তখন আমাদের লোক। আমার স্মৃতিতে ভাসছে ঃ ফ্যাসীবিরোধী সেই পোস্টার প্রদর্শনীতে কোলকাতা থেকে কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নটবর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রাজনীতিক নেতা এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক, পূর্ববঙ্গেরই সন্তান গোপাল হালদার ঃ এঁরা সবাই সেদিন কোলকাতা থেকে ঢাকা এসে পোস্টার প্রদর্শনীর এই অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।
আমার চোখে এখনো ভাসছে সেদিনকার সেই অনুষ্ঠানে আমাদের মুনীর তার অনবদ্য উচ্চারণে এবং নোয়াখালীর আঞ্চলিক মনোমুগ্ধকর ভাষায় ওর 'খড়ম' নাটকীয় গল্পটি পাঠ করে শুনিয়েছিল। মুনীরের যে-কোন পাঠ, পাঠের অধিক নাটকের চরিত্র গ্রহণ করত। ও যখন ওর 'খড়ম' শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে এল, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্নেহভরা হাতে ওকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আহা! কি ঐতিহাসিক সে ঘটনা! আমার স্মৃতিতে কি অমোচনীয় আনন্দময় ঘটনা। এই ছিল আমাদের মুনীর।

১৯৪৯ সাল থেকে আমার কারাজীবনের শুরু। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ে আমি রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে অন্য রাজবন্দীদের সঙ্গে আবদ্ধ।
কিন্তু মুনীরের সঙ্গে আমার প্রীতিবহনের স্মৃতি, সেই '৪৫, '৪৬, '৪৭-এর প্রীতিবন্ধনের স্মৃতি। আমাদের প্রগতি লেখক সংঘের সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক সাহিত্য সভায় ওকে সলিমুল্লাহ কিংবা ফজলুল হক হলের এলাকা থেকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করাই ছিল আমার অন্যতম করণীয় কাজ। মুনীর তখনি ইউনিভারসিটি তথা আবাসিক হলগুলোতে জঙ্গী মুসলিম লীগের আক্রমণের লক্ষ্য। কিন্তু তাদের সঙ্গে মুনীরের আচরণ যেমন ছিল কৌতুকের, তেমনি প্রতিপক্ষের জবাবদানের ক্ষমতার আধিক্য মুনীরের কোন হাস্যরসাত্মক বাক্যের তারা জবাব দিতে পারত না। ওরা মনে করত মুনীর তার কথায় ওদের প্রশংসা করে গেল। কিন্তু মুনীরের চলে যাওয়ার পরে ওরা নিজেদের পরস্পরকে জিজ্ঞেস করত ঃ মুনীর কি আমাদের প্রশংসা করল, না ঠাট্টা করে গেল। আমি বলতাম মুনীরকে কথার রাজা, 'কিং অব ওয়ার্ডস'। মুনীর তার কৌতুকপূর্ণ আচরণে আমাদের সকলের কাছে ছিল প্রিয়পাত্র, আদরের ধন। আমার অধ্যয়নের '৪৫, '৪৬ সালের স্মৃতিতে দেখছি মুনীর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলির বার্ষিক সাহিত্য আলোচনা কিংবা বিতর্কের অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রমহীনভাবে বিজয়ীর মুকুট পরে এক হল শেষ করে, নিজের সাইকেলটিতে চড়ে আর একটি হলের অনুষ্ঠানেও বিজয়ীর শিরোপা অতি সহজেই লাভ করে সবাইকে আনন্দে মুগ্ধ করে তুলছে। মুনীরকে সামনে রেখেই আমি কথা বলছি। ওর 'কবর' নাটক সংকলনটিকে আমি সংগ্রহ করেছি। নিজের স্মৃতিচারণের তাগিদে।
মুনীরের কবর সংকলনের ১৯৯৬ সালের সপ্তম মুদ্রণটির ভূমিকা লিখেছেন বেগম লিলি চৌধুরী। তাঁর ভূমিকার শুরুতে তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে লিখেছেন ঃ ''মুনীর চৌধুরী রচিত্র এবং তারই লিখিত ভূমিকা সম্বলিত 'কবর' বইটির জন্য নতুন করে ভূমিকা লেখার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, একথা ধারণা করা অসম্ভব ছিল। অথচ আজ তাই করতে হচ্ছে।
বিগত ৮/৯ বছর যাবত কে বা কারা বছরের পর বছর দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে কবর বইটির বেআইনী মুদ্রণে লিপ্ত আছে এবং এইভাবে মুনীর চৌধুরীর ন্যায্য উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে যাচ্ছে।'' বেগম লিলি চৌধুরীর এমন মর্মান্তিক উক্তির কোন উত্তর আমাদের সাহিত্য-শিল্পের কোন পক্ষ থেকে এসেছে বলে আমার জানা নেই।
বস্তুতঃ মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের চিরায়ত তাৎপর্য নিয়ে আমাদের উদ্যোগী এবং শক্তিশালী নাট্যাঙ্গনে যে তেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনও আমার মনে হয় না। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রাজবন্দী হিসাবে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ তার এবং আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন রনেশদা তথা রনেশ দাশগুপ্তের সস্নেহ হুকুমে রাজনৈতিক বন্দীদের রাজনৈতিক চেতনাকে বলিয়ান করার জন্য মুনীর তৈরী করেছিলেন চিরায়ত তাৎপর্যে পূর্ণ তাঁর 'কবর'। আমি জানিনে মুনীরের 'কবরের' বিপ্লবাত্মক তাৎপর্য নিয়ে যথোপযুক্তভাবে আমাদের সাহিত্যিকদের কে কোথায় কিভাবে আলোচনা করেছেন। কেবল আমি অজ্ঞ এবং তা জানিনে। সে আমারই অক্ষমতা এবং অপরাধ।
তবুও বলব সাম্প্রতিক ২০০৪-এর যে-অনুষ্ঠানটির কথা আমি উল্লেখ করেছি সেখানে মুনীরের পরিচয় জ্ঞাপনে 'শহীদ' শব্দটি যে যুক্ত হল না, তাও কি একটি অচেতন ভ্রান্তি, না সচেতন ইচ্ছাকৃত ত্রুটি?
মুনীর অবশ্যই আধুনিক সমগ্র বাংলা সাহিত্যের নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। কিন্তু তথাপি তার পরিচয় জ্ঞাপনে 'শহীদ' কথাটি অনুচ্চারিত রেখে যা কিছু আলোচনা করিনে কেন, তা যে কোন সাধু দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নয়, এ কথাটি বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই।
মুনীরকে আমরা আমাদের আত্মার অধিক বলে গণ্য করতাম। কোন মানুষই সীমাবদ্ধতাহীন নয়। তবু মুনীরের যে-সীমাবদ্ধতাই থাকুক না কেন, 'শহীদ মুনীর' চৌধুরী বাদে আমাদের সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় অস্তিত্ব যে একেবারেই অস্তিত্বহীন, এ কথাটি যারা তাকে দেখেছেন বা না দেখেছেন তাদের সকলকেই অমোঘ সত্য বলে মেনে নিতে হবে ঃ মহৎকে অস্বীকার করে কিংবা অনুপ্রেরণাহীন কোন আনুষ্ঠানিকতায় তাকে সীমিত রেখে মহত্তর কোন সৃষ্টি কেউ সৃজন করতে পারে না, সেই বোধটি থেকেই আজ আমি

মুনীরকে স্মরণ করার চেষ্টা করছি।
আমি জানি, একাজের আমি উপযুক্ত পাত্র নই। আমার আবেদন কেবল তাঁদের কাছে যাঁরা মুনীরের মর্মান্তিক হত্যা এবং তার মহৎ সৃষ্টির তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে চাইবেন, তাঁদের কাছে।
আলোচ্য সংকলনটির অন্তর্গত 'মানুষ' কাহিনীটিও আমাদের সকলের জন্য এক অপার অনুপ্রেরণার আকর।
...
মুনীর নিজের এই গ্রন্থের নাটক তিনটির (মানুষ, নষ্ট ছেলে, কবর) প্রথম প্রকাশকালে লিখেছিলেন ঃ 'এই নাটিকাত্রয়ের মধ্যে আমার এবং প্রদেশের জীবনচেতনাও অভিজ্ঞতা-অনুভূতির এবং বিশেষ গর্বের জ্বলন্ত ছাপ পড়েছে, কেবলমাত্র এই কারণেও এই পুরানো রচনাগুলো সংগ্রহযোগ্য বিবেচনা করেছি।'...
বাংলা একাডেমীর চরিতাভিধানে মুনীর চৌধুরী সম্পর্কিত আলোচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ ১৯৫৩ সালে মুনীর কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায় ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি রচিত 'কবর' নাটক ঐ বছর, ঐ বছরের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজবন্দীদের দ্বারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিনীত হয়'।
২১-১-২০০৫ ঃ শুক্রবার